শান্তিপুর ও শান্তিপুর কলেজ

ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

শান্তিপুর বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। এখানকার পণ্ডিতসমাজ, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য এবং তাঁদের ক্ষুরধার বিচার বৈদগ্ধ্য একসময়ে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলার বাইরে সুদূর বর্মাদেশেও (বর্তমানের মায়নামার) এইসব পণ্ডিতদের আহ্বান করে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানকার শেষ স্বাধীন রাজা থিবো শান্তিপুরের একপণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সময়েও শান্তিপুর একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে শান্তিপুরে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল টোল বা পাঠশালা। সেখানে সংস্কৃত ও বাংলা শেখানো হত। ১৮২২ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির পক্ষে হিল, ওয়ার্ডেন ও ট্রায়ান - এই তিনজন খ্রীস্টান মিশনারী শান্তিপুরে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। এঁদের আগমন স্বাভাবিক কারণেই এখানে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি প্রথায় শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে দেয়। শান্তিপুরে ইংরেজদের যে কুঠি বা ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল সেখানে তাদের কর্মচারীদের জন্য একটি নর্ম্যাল স্কুল ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছিল। এই কুঠির অন্যতম অধিকর্তা ওয়েঞ্জার সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন রামকমল ভট্টাচার্য বিদ্যালংকার॥ ঐ স্কুলে ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষাদান হত। আটদশজন পাদরী ও কয়েকজন পণ্ডিত এখানে পড়াতেন। এইসব পাদরীদের মধ্যে পাদরী বমওয়েচপর বর্তিকালে নীল আন্দোলনে ইংরেজদের বিরোধিতা করে বিখ্যাত হন। এই বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য রামকমল '' ধাতুবিবেক '' নামে বাংলাভাষার অন্তর্গত সংস্কৃত শব্দের মূল অর্থাৎ ধাতু সংগ্রহ পুস্তকটি লেখেন। এছাড়া তিনি ''প্রকৃতিবাদ '' নামে একখানি অভিধানও সংকলন করেন। সেইসঙ্গে পাদরী বমওয়েচও বাংলায় ''প্রথম পাঠনাপুস্তক, ১ম ভাগ '' ও '' পাঠনা প্রণালী প্রদর্শিকা '' লেখেন। এঁর লিখিত বাংলা গদ্য তৎকালীন সাধারণ লিখিত বাংলা অপেক্ষা সুশ্রাব্য ছিল। ক্রমে বমওয়েচ এই বিদ্যালয়কে কুঠির বাইরে বানকে নিয়ে আসেন এবং এখানে এদেশীয় ছাত্র পড়ানো আরম্ভ হয়। তিনি ঐখানে একটি বোর্ডিং স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। এই স্কুলটি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। অপর এক ইংরেজ হেজেল আর একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। এই হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ে শান্তিপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষালাভ করেন। এঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র (মতি) রায় ও দীনদয়াল প্রামাণিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

একদিকে যখন মিশনারীদের উদ্যোগে শান্তিপুরে ইংরেজি প্রথায় শিক্ষার ব্যবস্থা ভালভাবে চালু হয়েছে সেই সময়ে জমিদার উমেশচন্দ্র (মতি) রায় স্বীয় উদ্যোগে এখানে একটি মিশনারী-প্রভাব রহিত ইংরেজি বিদ্যালয় সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সালে চালু করেন। এখানে হিন্দু কলেজের পাশ করা এক যুবককে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন মিঃ এড্রু সেবিল। এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন চালু ছিল।

ইতিমধ্যে নদীয়ার অন্যান্য স্থানে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় শান্তিপুরের কিছু উৎসাহী শিক্ষিত ব্যক্তি এখানেও একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। এই ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেন হেজেল সাহেবের স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র জমিদার উমেশচন্দ্র (মতি) রায় ও ব্যবসায়ী দীনদয়াল প্রামাণিক। তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে ১৮৫৪ সালে শান্তিপুরে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেটি বর্তমানে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে। তার আগেই শান্তিপুরে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চতর পর্যায় সুরু হয়ে যায়। এরপর আরও অনেকগুলি ইংরেজি প্রথায় পরিচালিত বিদ্যালয় শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শান্তিপুরে ইংরেজি প্রথার উচ্চ বিদ্যালয় চালু হওয়ার পর প্রায় একশ' বছরের মধ্যে এখানে কোনো কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজই ছিল এখানকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র। যে অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কলেজ যেতেন তাঁরা এই সরকারী কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় ও পারিপার্শ্বিকতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই শান্তিপুরে কলেজের প্রয়োজনীয়তা খুব অনুভূত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজটি নবদ্বীপে উঠে আসে। তখনই শান্তিপুরের কোনো কোনো মহলে এখানেও একটি কলেজ স্থাপনের চিন্তাভাবনা সুরু হয়। যুদ্ধের ভয়ে অনেক শিক্ষিত পরিবার বাইরে থেকে এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরাই কলেজের অভাবটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর করান। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর এই প্রচেষ্টাকে দানা বাঁধতে দেয়নি।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর দলে দলে উদ্বাস্তুরা শান্তিপুরে চলে আসতে থাকেন। শান্তিপুরের জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এখানে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগও সুরু হয়ে যায়। শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একটি মুদ্রিত লিফলেটে এই কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এর জন্য শান্তিপুরবাসীর সাহায্য চান। প্রস্তাবিত কলেজের নামকরণ করা হয় 'অদ্বৈত কলেজ' এবং মুদ্রিত লিফলেটেও ঐ নাম ব্যবহৃত হয়। ঐ বৎসরের দুর্গাপূজার পর বান্ধব নাট্য সমাজের পক্ষ থেকে যে 'বিজয়া সম্মিলনী' হয় তাতেও পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র প্রস্তাবিত কলেজের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। কিছু নগদ অর্থ পাওয়া যায়। এভিন্ন বেশ মোটা অংকের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়। সকলের নামই লেখা হয়। একজন মহিলা (সম্ভবতঃ কৃষ্ণবল্লভ প্রামাণিক স্ট্রীটের উমা মুখোপাধ্যায়) তাঁর গায়ের অলংকার দান করেন। এইভাবে শান্তিপুরে কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক ক্রিয়া সুরু হয়।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম ও অকল্পনীয় দৃঢ়তা দেখান তা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয়। সমগ্র শান্তিপুরবাসী তাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। পণ্ডিত মৈত্র ঐ সময়ে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সংসদের সদস্য ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি ও বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান কেন্দ্রের নিয়ামক সমিতিরও সদস্য ছিলেন। ফলে নতুন কলেজ স্থাপন ও পরিচালন সম্পর্কে তাঁর একটি সম্যক ধারণা ছিল। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের

সঙ্গেও তাঁর প্রভূতপরিচয় ছিল। তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। পণ্ডিত মৈত্র তাঁর কাছে শান্তিপুরে নতুন কলেজ স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য চান। ইতিমধ্যেই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাইগাছি এলাকার খড়জোলায় একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ী (বর্তমানের কলেজ প্রাঙ্গণে) কেনা হয়েছিল। তখন সেখানে একটি মাত্র দোতলা ভবনের অংশবিশেষ বর্তমান ছিল — যেটি বর্তমানে অফিস ও শিক্ষকদের বিশ্রামগৃহরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকী পুরো বাগানটি দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় পণ্ডিত মৈত্র বুঝতে পারেন যে, সরকার ঐ সময়ে উদ্বাস্তুদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে চালু কলেজগুলির সম্প্রসারণের দ্বারা স্থান সংকুলানের জন্য বেশী আগ্রহী। পণ্ডিত মৈত্র তখন স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি তখন এই বাবদ অর্থ আদায়ের উদ্যোগ নেন। দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে পরের দিন তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ডাঃ রায়ের সঙ্গে পণ্ডিত মৈত্রের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাঃ রায় সর্বদা পণ্ডিত মৈত্রের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিধান রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন যেন অবিলম্বে ইন্‌সপেক্টর অব কলেজেস শান্তিপুরে গিয়ে কলেজ অনুমোদনের ব্যাপারটি স্বয়ং সরেজমিনে দেখে মতামত দেন। পরের দিন পণ্ডিত মৈত্র কলকাতায় এসেই ঐ অফিসারকে নিয়ে শান্তিপুরে জীপগাড়ী করে আসেন। তখন শান্তিপুরে ইট বাঁধানো ধূলোর রাস্তা। ইচ্ছে করেই প্রায় অপরাহ্ণকালে ঐ অফিসারকে নিয়ে তিনি খড়জোলা বাগানের গেটে এলেন। যখন গেট খোলা হল তখন প্রায়ান্ধকার ঐ বিশাল বনের দিকে তাকিয়ে ইন্‌সপেক্টর পণ্ডিত মৈত্রকে জিজ্ঞেস করেন ঐ বনে বাঘ আছে কিনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ঐ সময়ে বাইগাছির ঐ অঞ্চলটি শুধু বনে ভর্তি ছিল। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র খুব গম্ভীরভাবে বললেন যে, এই বনে না থাকলেও পেছনের বন থেকে মাঝে মাঝেই বাঘ এখানে আসে। অফিসার সাহেব আর কোন কথা না বলে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন যে, ভেতরে কলেজ চালানোর মত অনেক ঘর এবং ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর জমি আছে। পরের দিনই তিনি ঐ মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়কে রিপোর্ট দেন। পণ্ডিত মৈত্র এইভাবে কলেজের অনুমোদন আদায় করেন। তা না হ'লে পরিকাঠামোর অভাবে এই কলেজ অনুমোদন পেতনা।

ইতিমধ্যেই পণ্ডিত মৈত্র শান্তিপুরে কলেজ বর্তমান আছে এই কথা বলে তার সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ আদায় করে নেন। এই কাজে ডাঃ রায় তাঁকে প্রভূত সহায়তা করেন। শান্তিপুর যে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকা এবং এখানকার কলেজ সম্প্রসারণ করা দরকার এ ব্যাপারে ডাঃ রায় ও পণ্ডিত মৈত্র উভয়ে সুপারিশ করেন। রথতলার বাসিন্দা অমিয়নাথ সান্যালকে কোষাধ্যক্ষ করে এবং অনিলকুমার ভট্টাচার্য, বিশ্বরঞ্জন রায়, হরিদাস দে, সুধাংশু কুমার পাল প্রমুখকে সদস্য করে একটি কমিটি তৈরী হয়। তাঁরাই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করেন। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পরিশ্রম, উদ্যম, বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও অধ্যবসায় শান্তিপুরকে একটি বিশাল কলেজ উপহার দেয়।

নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজ শান্তিপুরবাসীর কাছে খুবই গর্বের ও সম্মানের বিষয়রূপে দেখা দেয়। কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী — সকলকেই শান্তিপুরবাসী অত্যন্ত সমীহ করতেন। কলেজটি শান্তিপুরবাসীর একান্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠানরূপে গৃহীত হয়েছিল।

সবশেষে শান্তিপুর কলেজ সম্পর্কিত দুটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। এর দ্বারা সে সময়কার জাতীয় নেতৃত্বের দেশের প্রতি দরদ ও সম্মান কিছুটা পরিমাপ করা যাবে।

কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে পণ্ডিত মৈত্র একদিন কলেজ পরিদর্শনে আসেন। দোতলার সিঁড়ির দেওয়ালে কোন ছাত্র পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখেছিল। পণ্ডিত মৈত্র সেদিকে তাকিয়ে কিছুটা পরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের জামাকাপড় বা গায়ে ঐভাবে দাগ দাও?' লজ্জিত ছাত্রেরা অধোমুখে তাড়াতাড়ি ঐ লেখাগুলি মুছে ফেলল।

আর একবার রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী কলেজ পরিদর্শনে আসেন। এই পণ্ডিত, দানবীর লোকটি স্বভাবে ও কাজে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। গলাআঁটা কোট, ধুতি ও পায়ে বুট পরিহিত রাজ্যপালকে ইংরেজি কবিতায় ও ভাষণে অভিনন্দন জানান তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল। জবাবে হরেন্দ্রকুমার বললেন ঃ " আমি বাঙালী, যিনি অভ্যর্থনা করলেন তিনিও বাঙালী। যাঁরা শ্রোতা তাঁরাও বাঙালী। তহলে কেন নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা দেখিয়ে অপরের ভাষায় কথা বলা হচ্ছে? কিন্তু যেহেতু ইংরেজিতেই সবকিছু বলা হয়েছে তাই বাধ্য হয়ে আমি ইংরেজিতেই বলছি।" এই বলে তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন।

"মানুষের প্রধান শক্তি আবেগের উৎসমুখ হতে উৎসারিত, যুক্তি থেকে নয়।" — রঁমা রলাঁ